ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

মইদুল ইসলাম

ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস নয়। সমস্ত ধর্মীয় মৌলবাদীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত নয়। আবার অনেক সন্ত্রাসবাদীর ধর্মীয় মতাদর্শের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যেমন ভারতে উত্তর-পূর্বের বহু রাজ্যে এমন অনেক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যারা ধর্মের জন্য সন্ত্রাস করে না। সম্প্রতি কোকরাঝাড়ের আদিবাসী গণহত্যায় যে বোড়ো জঙ্গিরা জড়িত বলে অভিযোগ, তারা কোনো ধর্মীয় মতাদর্শ দ্বারা চালিত নয়। ভারত সরকার মাওবাদীদের যে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করেছে তারাও কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রতিনিধিত্ব করে না। আবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার সরকার যে 'লিবারেশন টাইগারস অফ তামিল ইলম' (এলটিটিই) জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করেছে তারাও ধর্মের রাজনীতি করে না। 'রেভলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অফ কলম্বিয়া', 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি', 'কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি' ইত্যাদি এমন অনেক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আছে যারা হয় জাতীয়তাবাদী বা অন্য কোনো মতাদর্শের রাজনীতি করলেও, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মকে খুব একটা ব্যবহার করে না।

অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদ শুধু ইসলামের নামে কিছু মুসলিমই করে না। শিখধর্মের নামে খালিস্তানি জঙ্গিরাও সন্ত্রাসবাদী কীর্তিকলাপ করে। অহিংসার বার্তা দেওয়া বৌদ্ধ ধর্মের নামেও সন্ত্রাসবাদ হয় থাইল্যান্ড, মায়ানমার, জাপান এবং তিব্বতে। বৌদ্ধধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জাপানে 'আউম শিন্রিক্য' ও মায়ানমারের 'ডেমোক্রেটিক কারেন বুদ্ধিস্ট আর্মি' যা পরে ভেঙে একটা খ্রিস্টান ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি'-র আকার নেয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আবার এমন অনেক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যারা খ্রিস্টান ধর্মীয় বিশ্বাস, খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুশাসন ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মেলবন্ধনে তৈরি। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যেতে পারে 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা' ও 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড' এর। বিশ্বে খ্রিস্টান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল লেবানন ও সিরিয়াতে 'মারোনাইত জঙ্গি', উত্তর আয়ারল্যান্ডের 'অরেঞ্জ ভলন্টিয়ার্স', 'লয়ালিস্ট ভলান্টিয়ার ফোর্স' ও 'রেড হ্যান্ড ডিফেন্ডারস', আমেরিকাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী 'আর্মি অফ গড', উগান্ডায় 'লর্ডস রেসিস্তান্স আর্মি' এবং ইউরোপে বেশ কিছু নয়া-নাৎসি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সাম্প্রতিককালে নরওয়েতে আন্দের্স বেহরিং ব্রেইভিকের দ্বারা সঞ্চালিত ভয়ঙ্কর নয়া ফাসিবাদী সন্ত্রাস খবরের শিরোনামে ছিল। 'জেবিশ আন্ডারগ্রাউন্ড', 'ব্রিট হাকানায়িম', 'কিংডম অফ ইসরাইল'-র মতো কিছু মুসলিম ও কমিউনিস্টবিরোধী ইহুদি ধর্মমতভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এফবিআই-এর একটা হিসেব বলছে যে মার্কিন মুলুকে ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সমস্ত সন্ত্রাসবাদী ঘটনার জন্য মুসলিম 'জঙ্গি' সংগঠনগুলো কেবল ৬ শতাংশ ঘটনায় অভিযুক্ত আর কমিউনিস্টরা ৫ শতাংশ ঘটনায় অভিযুক্ত। তুলনায় বেশি সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় অভিযুক্ত ল্যাটিনোরা (৪২ শতাংশ), চরমপন্থী বাম দলগুলো (২৪ শতাংশ), ইহুদি 'জঙ্গি' সংগঠনগুলো (৭ শতাংশ) এবং অন্যান্যরা (১৬ শতাংশ)।

ধর্মীয় মৌলবাদীরা মানুষের কানে কুমন্ত্রণা দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছে। ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রেণি ও ভাষার মতো কিছু মৌলিক বিষয়। মানুষ ধনী, মধ্যবিত্ত না গরিব অথবা পুঁজিপতি, কৃষক না শ্রমিক পরিবারে জন্মেছে—কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট পরিবারে জন্মাবার কারণেই কিছু অধিকার সে জন্মসূত্রে পায় বা বঞ্চিত হয়। আবার জন্মাবার পরে ভাষা না শিখলে তো সে ধর্মের কথা ভাবতে পারবে না। 'গড', 'ঈশ্বর', 'ভগবান', 'খুদা', 'আল্লাহ' বলতে গেলে, কোনো ধমগ্রন্থ পড়তে গেলে বা ধর্মচর্চা করতে গেলে তো হয় মাতৃভাষা বা অন্য কোনো একটা ভাষা শিখতে হয়। ধর্ম এমন একটি আধিপত্যবাদী নির্মাণ যা শিশু অবস্থায় মজ্জাগত করা হয়। ভবিষ্যতে শিশু কোন ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বাঁচবে তা অনেকটাই সেই শিশুর পিতা-মাতার ধর্মীয় পরিচয়ের উপর

নির্ভর করে বা অনাথ শিশুর ক্ষেত্রে সে কোন ধর্মীয় অবয়বের মধ্যে বড়ো হচ্ছে তার উপরে নির্ভরশীল। অথচ সেই যুক্তিতে কিন্তু আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পারসি ইত্যাদি বলার পরিবর্তে 'কংগ্রেস শিশু', 'কমিউনিস্ট শিশু', 'আরএসএস শিশু' বা 'উদার শিশু', 'বামপন্থী শিশু' বলি না যদি সেই শিশুর ওরকম কোনো একটি পরিবারে জন্ম হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে ওই শিশু বড়ো হয়ে কিন্তু তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে বা যেকোনো ধর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, স্রষ্টা নেই বলে নাস্তিকও হতে পারে। কিন্তু সেই শিশু জন্মসূত্রে পাওয়া বা না-পাওয়া শ্রেণিগত সুযোগ-সুবিধা এবং তার মাতৃভাষাকে অস্বীকার করতে পারে না বললেই চলে। আজ বিশ্বায়নের যুগে ভারতের মতো উত্তর-ঔপনেবেশিক দেশে যদিও এক শ্রেণির শিশু আবার মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দ নয়। ইংরেজি তাদের প্রথম ও শেষ ভাষা। তাই মাকে 'মামি' আর বাবাকে 'ড্যাডি' বলে বড়ো হচ্ছে। তাহলেও সে ওই বিলেতি ভাষায় বড়ো হচ্ছে তো কেবল একটা বিশেষ শ্রেণিগত অবস্থানের জন্যই। অর্থাৎ শ্রেণি ও ভাষা, ধর্মের ভাবনার থেকে অনেক বেশি মৌলিক। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের পরিচিতিকে শান দিয়ে বাকি পরিচয়গুলোকে ভুলিয়ে দিতে চায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' মনমোহন মিত্র তাই অনেক ভেবেচিন্তে এই বক্তব্য রেখেছিলেন— 'যে জিনিশ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, আমি তাকে মানি না। রিলিজিওন (ধর্ম) এটা করেই আর 'অরগানাইজড রিলিজিওন' (সংগঠিত ধর্ম) তো বটেই।' দুই বাংলার ইতিহাস সাক্ষী যে শ্রেণি ও ভাষার ভিত্তিতে রাজনীতি এহেন ধর্মীয় রাজনীতির মোকাবিলা করতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' ছবি থেকে শিখতে পারি যে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে শুধু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত করে না বরং মৃত্যুমুখ পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে। আবার ধর্ম না মেনে বা সম্পূর্ণ অধার্মিক হয়েও মানুষ অত্যন্ত সৎ হতে পারে। 'গণশত্রু' ছবিতে ডাক্তার বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোয় পুষ্ট এবং যিনি মানুষকে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজ বাংলায় এমন কিছু হবু ডাক্তার আছে যাদের কোর্পান শাহ নামক একজন প্রতিবন্ধী ও গরিব সংখ্যালঘু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপেনি। আজ ধর্মীয় বাবাজিদের সৃষ্টি করা বহুল প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রচারের জন্য সাহসী, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনির্ভর মনন আরো বেশি প্রয়োজন।

সম্প্রতি পেশোয়ারের স্কুলে নিষ্ঠুর তালিবানি জঙ্গি হানা ও বর্ধমানের খাগরাগড় বিস্ফোরণ কান্ডের পরে আবার নতুন করে 'মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী' বলে গণমাধ্যমের একাংশে প্রচার শুরু হয়েছে। ওরকম অপপ্রচার আমেরিকায় ৯/১১ জঙ্গি হানার পরেও বেশ জোরদার হয়েছিল। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন একটা নতুন 'শত্রু' খোঁজা শুরু করেছিল। তারপর মুসলিম দেশগুলোর তেল ও খনিজ ভাণ্ডার দখল করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ গবেষক, প্রচারমাধ্যম, নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা বিশেজ্ঞরা তথাকথিত 'মুসলিম অশনিসংকেতের' তত্ত্ব খাড়া করল। তাই ইরাক ও আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য মতাদর্শগত সমর্থন জোগানের চেষ্টা হয় 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র নামে অথবা 'গণতন্ত্র ও শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধর নামে। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব কী সত্যি 'সন্ত্রাসবাদী'? চিরকাল কী মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামী মৌলবাদীরা দাপিয়ে বেরিয়েছে?

বিংশ শতাব্দীর মাঝে (১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে) মুসলিম বিশ্বে অনেকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বিরাজ করছিল। সেইসব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারা কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল তো অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সমাজবাদী এবং কমিউনিস্ট। সৌদি আরব উপদ্বীপকে বাদ দিলে ওই সময়কালে, মুসলিম দুনিয়ার বেশিরভাগ অংশ ইউরোপীয় আলোক-সম্পাতের বিপ্লবী ধারার অভিপ্রকাশ যথা ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদী ও জনমোহিনী রাজনীতিকে সামনে রেখে একদিকে যেমন গামাল আবদেল নাসের মিশরে শাসন করেছেন, টিউনিসিয়ায় রাষ্ট্রপতি হাবিব বুর্গিবা নেতৃত্ব দিয়েছেন, আলজেরিয়াতে উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিকামী ফ্রন্ট লড়েছে। ২০১২ সালের নির্বাচনেও আলজেরিয়াতে জাতীয় মুক্তিকামী ফ্রন্ট সংসদে সবথেকে বড়ো রাজনৈতিক দল। আবার অন্যদিকে বাথ পার্টি ইরাক ও সিরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিল এবং আফগানিস্তান ও দক্ষিণ ইয়েমেনে কমিউনিস্ট দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। ওইসব আধুনিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের পূর্বসূরি ছিলেন ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। মিশরে নাসেরের আগে মহম্মদ আলী ও খেদিতে ইসমাইল বা ইরানের শাহ (রাজা) যে 'আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের' আড়ালে আধুনিক আর্থ-সামাজিক প্রকল্পগুলো রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল, ১৯৫০-এর দশক থেকে মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রগতিশীল সরকার সেই আধুনিকীকরণের রাস্তা আরো ত্বরান্বিত করেছিল। পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল।

উপরে উল্লেখিত শাসকরা অনেকেই পরবর্তীকালে কর্তৃত্ববাদী হয়েছিল। ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিল। কিন্তু তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল।

পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে দুর্বল করে ইসলামি রাজনীতিকে তোল্লাই দেওয়ার পেছনে। ১৯২০-র দশকে 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' নামক মৌলবাদী সংগঠনটি ব্রিটিশ উপনিবেশ শক্তি ও মিশরের রাজপরিবারের মদতে তৈরি হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'ওয়াফদ' পার্টিকে রুখতে। কয়েক দশক পরে গামাল আবদেল নাসেরের মৃত্যুর পর সৌদি আরবে রাজনৈতিক শরণার্থী হয়ে থাকা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নেতৃত্ব ও কর্মীরা দলে দলে মিশরে ফেরে সিআইএ ও মার্কিনপ্রেমী রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাত-এর তত্ত্বাবধানে। ১৯৫১ সালে ইরানে মোস্সাদেঘ-এর নেতৃত্বে এবং কমিউনিস্ট (তুদেহ) পার্টির সাহায্যে এক প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয় যারা ইরানের তেল ভাণ্ডারগুলো জাতীয়করণ করে। এর ফলে ১৯৫৩ সালে সিআইএ-এর মদতে মোস্মাদেঘের মতো গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পুতুল সরকারকে বসানো হয়। ইন্দোনেশিয়াতে এককালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের বাইরে সবথেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকার্নোর নাসাকম মিত্রশক্তির সঙ্গে কমিউনিস্টরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে সিআইএ-এর মদতপুষ্ট সুহার্তোর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং অন্তত পাঁচ লক্ষ কমিউনিস্টকে খুন করা হয়। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো মুসলিম দেশে তৃতীয় বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে খতম করে দেওয়া হয়। ১৯৬০-এর দশকে সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি আফ্রিকার সবথেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদধন্য গাফার নিমেইরির সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং ১৯৭১-এর কমিউনিস্ট নেতা আবদেল খালিক মাহজুব-সহ সুদানের কমিউনিস্টদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সাউর বিপ্লব করেছিল। একথাও মনে রাখা দরকার যে ইসরাইলি সরকার একসময়ে 'হামাস' নামক ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনকে মদত দেয় ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী 'পালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেসন' (পিএলও)-কে দুর্বল করতে। পাকিস্তানে জিয়া-উল-হক ও বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে মার্কিন প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন ছিল। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে সোভিয়েত ও আফগান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৮০-র দশক জুড়ে আমেরিকার সিআইএ, সৌদি আরব, ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেন-সহ ইসলামি মুজাহিদিনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল। লিবিয়াতে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মুয়াম্মার গদ্দাফি আরব জাতীয়তাবাদী ও আরব সমাজতান্ত্রিক নীতি রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৯৯ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে গদ্দাফি পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক বোঝাপড়া করলেও ২০১১ সালে লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'ন্যাটো'-র সামরিক অভিযান গদ্দাফির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন দেয়। এই গৃহযুদ্ধ চলাকালীন গদ্দাফির মৃত্যু হয়। উপরে উল্লেখিত সবকটা মুসলিমপ্রধান দেশে কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্ট ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যখনই দুর্বল হয়েছে তার পর থেকেই ইসলামি মৌলবাদ ওইসব দেশে মাথা চাড়া দিয়েছে।

মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কখনো কর্তৃত্ববাদী হয়ে গিয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দুর্বল হয়েছে। আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, গণতন্ত্রবিরোধী সামরিক ও ইসলামি শক্তিগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে দুর্বল করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা অনেক পুরোধা ব্যক্তিত্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুজফ্ফর আহমেদ, সৌকত উসমানী, শাকির আলী খান, আবাদুল হালিম, আবদুল্লাহ রসুল, মহম্মদ ইসমাইল, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, মনসুর হবিবুল্লাহ, আবুল বাসার, আব্দুল বারি, মহম্মদ ইসরাইল, পাললি মহম্মদ কুট্টি প্রমুখ। পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা হলেন সাজ্জাদ জাহির, ফৈজ আহমেদ ফৈজ, সুলতান আহমেদ খান তারিন, হাবিব জালিব, আহমদ ফারাজ, মীর গুল খান নাসির। পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা হলেন জালালউদ্দিন আবদুর রহিম, আবদুল মতিন, সিরাজ শিকদার, কাজী জাফর আহমেদ, আবদুল হক, মহম্মদ তোহা, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রব, বদরুদ্দীন উমর, রাশেদ খান মেনন। ১৯৩০-র দশক থেকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে মূলত উর্দু সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট ছিল। ওই প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাদাত হাসান মান্টো, ইসমত চুঘতাই, কৈফি আজমী, হবীব তনভির, আলী সর্দার জাফরী, জোশ মালিহাবাদী, জান নিসার আখতার, মজরুহ সুলতানপুরী, মখদুম মহিউদ্দিন, রশিদ জাহান, আহমেদ আলী, ফিরাখ গোরখপুরী, সাহির লুধিয়ানভি, আসরার উল হক মাযাজ, আহমেদ নদীম কাসমী, রাহী মাসুম রাজা। এই প্রবন্ধে অনেকগুলো নাম থেকে পরিষ্কার যে মুসলিম পরিবারে কেউ

জন্মালেই মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী হয়ে যায় না। তারা অনেকেই প্রগতিশীল ও বামপন্থীও হতে পারেন।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরে ইদানীং বাংলাদেশি জঙ্গি যোগাযোগের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যেটা আজকাল বলা হচ্ছে না সেটা হল বর্তমান বাংলাদেশি সরকারের ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের কথা। বাংলাদেশে যেমন ধর্মীয় মৌলবাদীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হচ্ছে বা আমৃত্যু কারাদণ্ডে পচানো হচ্ছে, আমাদের 'মহান' 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত রাষ্ট্রের যেসব আরএসএস কর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ও নান্দেদ, মালেগাঁও, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনায় অভিযুক্ত, তাদের সকলকে ওরকম কঠিন শাস্তি দিতে কোনোদিন পারব? বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি করা দল, জামাত-এ-ইসলামি বারো শতাংশের বেশি কোনোদিন ভোট পায়নি। সংখ্যাগুরু মানুষের সমর্থন তো দূরের কথা। বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত জামাত কোনোদিন তিনশোর মধ্যে আঠারোটার বেশি আসন পায়নি। অথচ আমাদের 'মেরা ভারত মহান' স্লোগান তোলা 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে শুধু ৩১ শতাংশ মানুষের সমর্থনই জোটে না, বরং সংখ্যাগুরু আসন পেয়ে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হন যিনি ২০১৩ সালেও এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, সংখ্যালঘু মানুষকে 'কুকুর শিশুর' সঙ্গে তুলনা করতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হন না। তবে বাংলাদেশে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন নয়। ওখানে চট্টগ্রামের আদিবাসীরা, বিহারীরা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের একাংশ প্রান্তিক জীবনযাপন করছে, বেশ কিছু অভাব অভিযোগ নিয়ে। সেটা বাংলাদেশের কাছে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। তাই শাহবাগের মতো মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ জোরদার আন্দোলন করে, তাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী, বিহারী ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে নিয়েও আন্দোলন করা উচিত।

শ্রেণি ও ভাষাগত ঐক্য ভাঙতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের শরণাপন্ন হয়। তাই ভিএইচপি-আরএসএস-বিজেপি নেতারা 'আমরা সবাই হিন্দু' এবং 'ভারত একটা হিন্দু রাষ্ট্র'-র মতো কিছু অসাংবিধানিক বক্তব্য জনসমক্ষে রাখছে। ওইসব দলগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করার পুরোনো অভ্যেস বা গুজরাটের মতো গণহত্যায় হাত পাকাবার গুরুতর অভিযোগ আছে। তারা আজ এই রাজ্যেও আগের থেকে অনেক বেশি সোচ্চার। অন্যদিকে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত, বাংলায় বিজেপি-র মতো একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট দলের সঙ্গে আঁতাত করে লোকসভা ও বিধানসভা মিলিয়ে চার চারটে নির্বাচন লড়ে তৃণমূল এখন ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হবার চেষ্টা করছে। এখন তারা আবার কিছু মৌলুবিকে তোল্লাই দিচ্ছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের, সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ওই ভাতার কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি আছে কি না বা অন্য সাধারণ গরিব মুসলমানদের ভাতের হাঁড়ির কী হবে সেই নিয়ে তৃণমূলের কোনো মাথাব্যথা নেই। ভারত রাষ্ট্রের সংসদে পেশ হওয়া সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলো পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে ও কতোটা প্রয়োগ করা হল, তা নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক তর্জা হচ্ছে না। বরঞ্চ অসাংবিধানিক ইমামভাতা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে আর বিজেপি হিন্দু পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মানুষের একাংশকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। রাজ্য রাজনীতির জন্য এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক চিহ্ন। বাংলার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনীতির দীর্ঘ ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, জোরদার শ্রেণিআন্দোলন এবং দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে সামনে রেখে সুদীর্ঘ জনআন্দোলন সংগঠিত করে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে একসঙ্গে মিলেমিশে রুখতেই হবে।

আরেক রকম

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
১৬-৩১ জানুয়ারি ২০১৫ ১-১৫ মাঘ ১৪২১

নামে কী এসে যায় কে জানে। তুষার কালো।
কৃপা না ঘৃণা? আদিবাসী ভারত। মন্ত্রী যখন
কয়েদি। ক্যানসারবিদ্যা ও মন্দভাগ্যের কলরব।
অমিত্রাক্ষর। জলবায়ু ও মার্কিন রাষ্ট্রনীতি।
ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ।
ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও জীবনানন্দের কবিতা।
একটি অভিনব বই। বিজ্ঞানের সংকট।

মূল্য : ২০ টাকা